আগডুম বাগডুম
কার্তিক ঘোষ

কার্তিক ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা

প্রকাশনা []
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটারজি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Acc No - 14990

প্রথম প্রকাশনা []
মহালয়া ১৩৯০
দ্বিতীয় মুদ্রণ []
অক্টোবর ১৯৮৮
আশ্বিন ১৩৯৫
তৃতীয় মুদ্রণ []
ডিসেম্বর, ১৯৮৯
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬
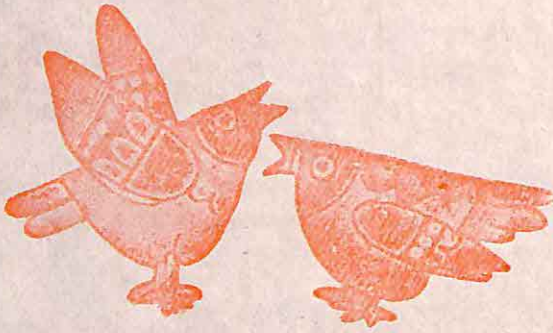
মুদ্রণ []
শ্রীপরেশনাথ পান
ইন্দ্রলেখা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
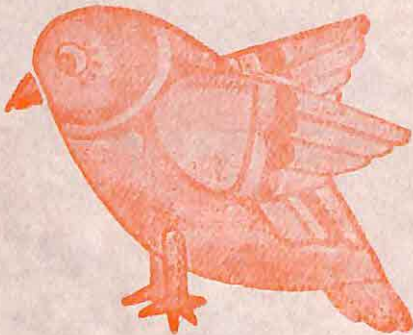
অলংকরণ []
শ্রীধীরেন শাসমল

দাম ঃ কাগজে বাঁধাই [] ছয় টাকা
~~বোর্ড বাঁধাই [] আট টাকা~~

প্রিয় ছড়াকার সুধীন্দ্র সরকার
এবং
কবি বন্ধু দীপক রায়কে

পাতায় পাতায়

ভুতনি

জান ত, আজ আমি ইসকুল যাই নি! দুপুরের গাড়িতে মামাবাড়ি যাব কি না, তাই।

বারে, জান না? কাল যে আমার তোতামাসির বিয়ে। সেই জন্যে বাপি একটা নতুন জামা কিনে দিয়েছে আমাকে। টুকুনকে দেখিয়েছি। রিংকু আর মুন্না এখখুনি আসবে। ওদেরও দেখাব।

শুধু দেখাব না একজনকে। না। না। বাপপার কথা বলছি না। আমি বলছি আমাদের ভুতনির কথা। ওটা বড্ড হিংসুটে! কিছু একটু ভাল দেখতে পারে না আমার। সব সময় শুধু খুনসুটি। তাই ওটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না বিয়ে বাড়িতে! খুউব মজা! ও থাকবে একলা একলা কেষ্টর মায়ের কাছে। বেশ হবে!

আমরা কেমন মামাবাড়ি চলে যাব। তোতামাসির বিয়েতে মা কেমন বেনারসী পরবে। কিন্তু বাপি বলছিল, দিদিমা নাকি খুব কান্নাকাটি করবে। তোতামাসি বাড়ির ছোট মেয়ে কি না!

দুপুরে আমাদের গাড়ি। তাই সক্কাল থেকেই সব বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেছে। ইস্টিশনে গাড়ি এসে থামলেই টপ করে উঠে পড়তে হবে আগে! বাপি বলেছে, ইলেট্রিক ট্রেন বলে কথা! থামতে না থামতেই ছেড়ে দেয়। ছোট ছেলেমেয়েদেরও ধার ধারে না।

শুধু একবার আমি দেখেছিলুম, সেই যেবার আমরা মধুপুর যাই, সেবার শুধু ছাড়তে ছাড়তেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আমার জন্যে। ইস্টিশনের একটা কলে জল খাচ্ছিলুম কি না!
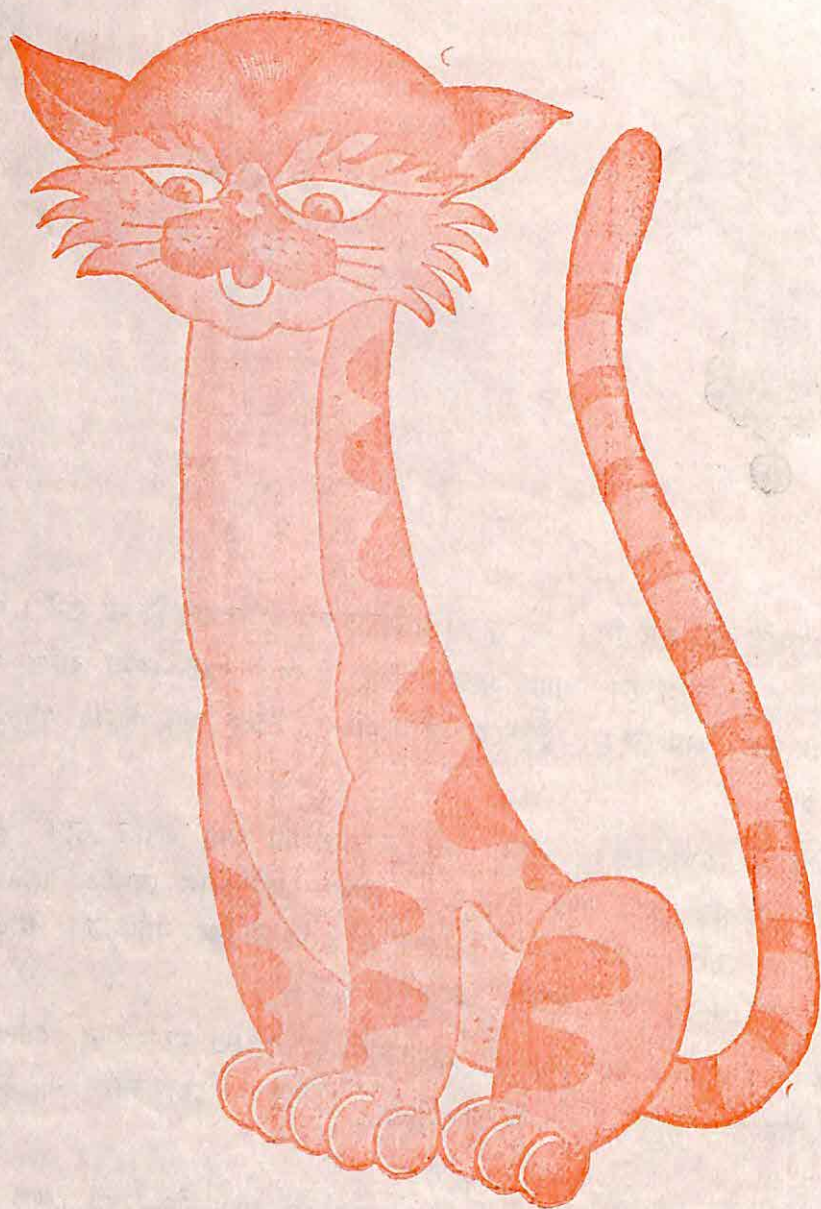
গার্ড সাহেবটা খুব ভাল লোক ছিলেন। আমি গাড়িতে উঠে পড়তে তবেই বাঁশি বাজিয়ে সবুজ নিশেন দেখিয়ে দিলেন।

ভুতনি সেবারও মধুপুরে যায়নি। ও শুধু একবার দীঘা গিয়েছিল মাত্র। তাতেই সেবার ওর কি খুশি!

আমার মামাবাড়ির নাম হলুদপুর। সেখানে রেলগাড়িও যায় না—ভুতনিও কখনো যায়নি। তবে সেখানে কেমন একটা বড় নদী আছে। নদী দিয়ে কত্তো নৌকা যায়। কোনটায় পালতোলা, কোনটায় দড়ি-দড়া, হাল-টাল খোলা!

নদীর ধারে ধারে কত খড়ের ছাওয়া মাটির ঘর।

হাটতলা।

খেয়াঘাট।

কাশফুলের পাহাড়!

ভুতনিটা আমাদের সঙ্গে শহরেই থাকে ছোটবেলা থেকে! তাই ও এসব দেখলে নিশ্চয়ই আর দুষ্টুমি করে বেড়াত না সব সময়। কিন্তু ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব কি, দিদিমা যে একচোখখে দেখতে পারে না ভুতনিকে!
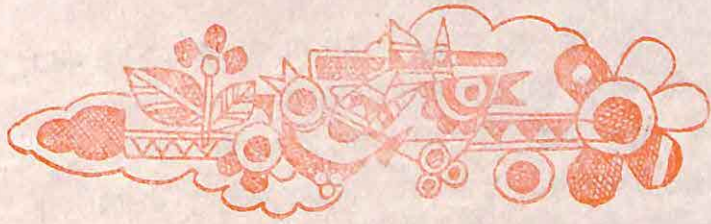
অনেক রাত পর্যন্ত কাল জেগে ছিলুম। ঘুমোই নি।

ভুতনিটা সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। খাটের তলায় ওর কেমন নরম তুলতুলে বিছানা। বাপি তৈরি করে দিয়েছে নিজের হাতে।

ওকে অবিশ্যি বলিনি। বললে কি আর ও সকাল সকাল ঘুমোতে যেত ?

আমি শুধু টুনুর কানে কানে বলেছিলুম।

বাপিকেও বলে রেখেছিলুম চুপিচুপি। বাপি বলেছিল, আপিস থেকে ফেরার সময় ঠিক কালকে মনে করে আনব।

তাই কালকে ঘুমুতে যাইনি সহজে।

ইস্! বাপি কি আর সকাল করে কোনোদিন ফেরে।

জেগে থাকতে থাকতে ঢুল ধরে গেল একসময়। পাশের বাড়ির টিংকুর ছোটকাকু আপিস থেকে চলে এল। না। বাপি তবু এল না।

ঘুমোতে যেতে কি আর ইচ্ছে করে। বাপির আবার যা ভুলো মন। রোজ একটা না একটা মায়ের কোন দরকারি জিনিস ঠিক ভুলে চলে আসবে।

তখনো কিন্তু মাকে কিচ্ছু বলিনি। বললেই ত মা একচোট বকুনি দেবে। বলবে, এখন শুধু পড়াশোনা করতে হয় মন দিয়ে। ছেলেমানুষের মতন রথ টানবে কি ?

আচ্ছা, তোমরাই বল, রথ বুঝি শুধু ছেলেমানুষরাই টানে! সেবারে যে তবে টুনুর দিদিমা পুরী গিয়েছিলেন রথ টানতে! আমাদের ড্রইং দিদিমনি যে প্রতিবছর মাহেশের রথ টানতে যান তাঁর ছেলেকে নিয়ে! তার বেলা ?

কাল তাই শুতে গিয়েও মাকে কিচ্ছু বলিনি। বাপির ওপর রাগ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে!
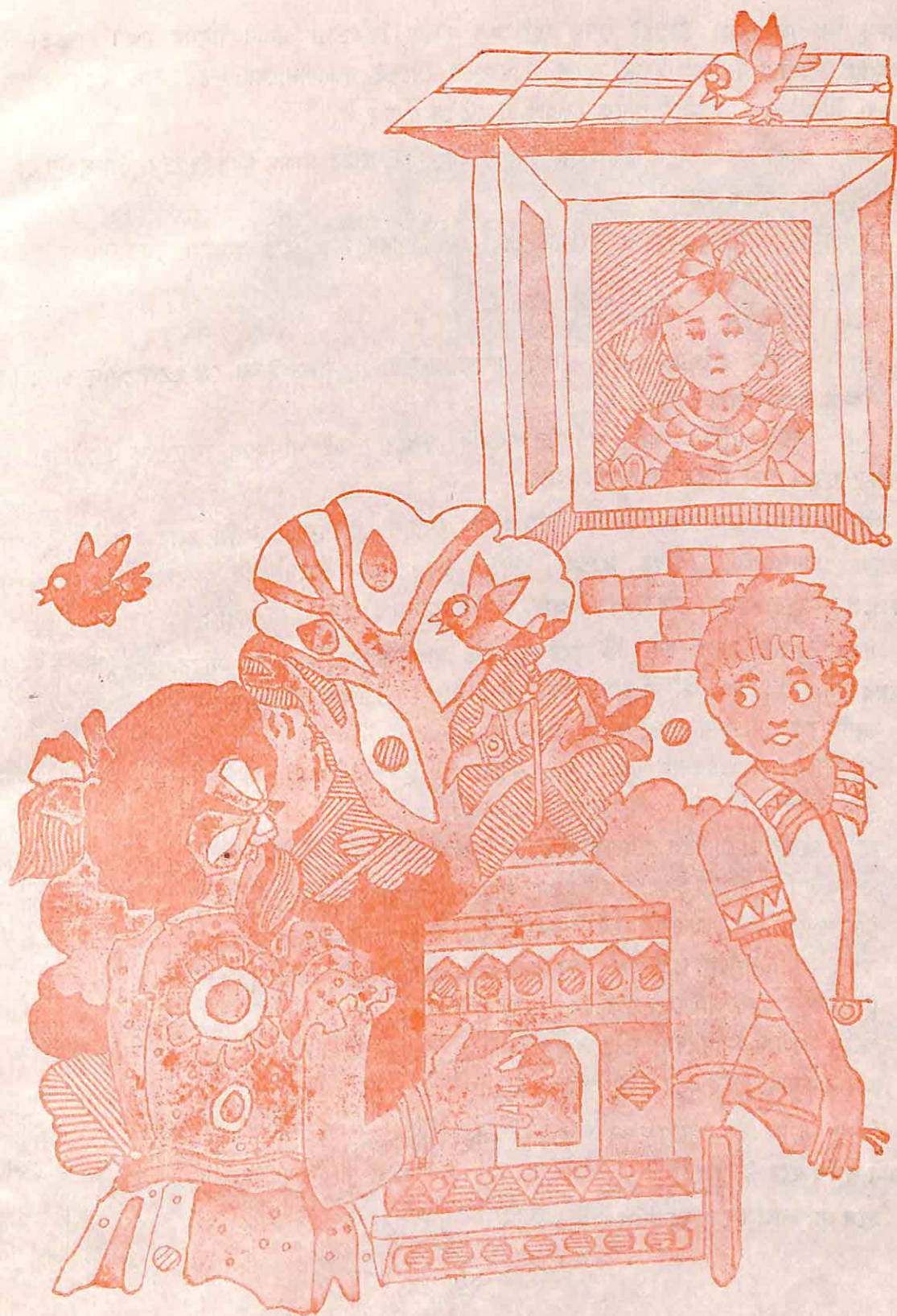
কিন্তু সককাল বেলা উঠতেই দেখি টেবিলের তলায় তিনতলা একটা টিনের রথ। ভুতনিটা বোধহয় পাহারা দিচ্ছিল ল্যাজ তুলে। আমাকে দেখেই ভালমানুষের মতন মুখ করে বললে, ম্যা-ও, মি-আঁ-ও। মানে, আমাকে একবার টানতে দেবে ত ?

ইস্, ভারী বয়ে গেছে তোমাকে টানতে দিতে! আমি আগে খবর দিতে ছুটলুম টুনুকে। সেখান থেকে টুবলুর কাছে।

রথটা বারান্দায় বার করে সাজাতে যাব এমনি সময় মা এসে বললে, তোদের বলরাম কোথায় ? দেখছি না!

ওমা! তাইত!

ছুটে গেলুম বাপির কাছে। বাপি বললে, এই যা, বলরামকেই আনতে ভুলে গেছি তাহলে। কিন্তু এখন উপায় ?

টুনু বললে, দাঁড়া। মাথা খাটিয়ে একবার দেখি! এই না বলে কোত্থেকে একটা কাঠের খোকা-পুতুল এনে বসিয়ে দিলে রথের মধ্যে!

বিকেলবেলা আমাদের তিনতলা টিনের রথ বেরুল রাস্তায়। টুপসি আর টিংকুদেরও রথ বেরুল তারপরেই! ওদের দুতলা কাঠের রথ! ওরা আমাদের বলরামকে দেখে হেসে ফেললে। টুনু বললে, হাসুকগে। আমাদের রথ নতুন। ওদেরটা পুরনো।

টুবলু একটা কাঁসর ঢঙ ঢঙ করে বাজাতে বাজাতে চলল। মুন্নি মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের জানলায়। ওর বাপির অসুখ কিনা, তাই ওকে কেউ একটা রথ কিনে দেয়নি।

আমি বললুম, আয় না মুন্নি, রথ টানবি না ?

কে জানে কেন ওর চোখ দুটো ছলছল করছিল! তবু বললে, মা যদি আবার বকে ?

টুনু বললে, না। না। বকবে কেন, আয় না।

মুন্নি অমনি ছুটে এসে রথের রশিতে টান দিলে!

ওদের বাড়ি পেরিয়ে টুবলুদের বাগানের সামনে গিয়ে রথ থামল আমাদের।

টুনু বললে, কিন্তু জগন্নাথ ত মাসির বাড়ি যাবে আজকে! তাই না ?

সবাই অমনি বললে, তাই ত! তাহলে এখন জগন্নাথের মাসি কে হবে ?

টুপসিরা বললে, আমাদের জগন্নাথের মাসি হচ্ছে টিংকু!

আমি বললুম, আমাদেরও তাহলে মুন্নি।

অমনি সবাই হৈ-হৈ করে উঠল আনন্দে!

কিন্তু মুন্নি কি আর তখন দাঁড়ায়! পাঁই পাঁই করে ছুট দেয় বাড়ির দিকে! ও যেন কেমন খুশি হয়ে উঠল হঠাৎ।

হবে না, আজ যে রথের মাসি হয়েছে মুন্নি।

এক শালিক

সক্কালে উঠেই বাগানে একটা শালিক দেখে ফেলেছি। জান ত, এক শালিক দেখতে নেই। দেখলেই নাকি ঝগড়া হয়। শুধু ছোটপিসিই না, তোতা মাসিও বলেছিল একদিন !

এক শালিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুজতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু চোখ বুজেই আর কি করব তখন! তাড়াতাড়ি বাগানের এপাশে ওপাশে আর একটাকে দেখতে পাই কি না খুঁজতে লাগলুম।

কিন্তু না! কোথ্থাও আর একটা শালিককে দেখতে পেলুম না! তাহলে কি করব! এখ্খুনি যে কারো সঙ্গে ছগড়া হয়ে যেতে পারে!

ভাবতে ভাবতে বাগান থেকে বাড়িতে ছুটলুম। বাড়িতে গিয়েই দেখি কেষ্টার মা গজ গজ করছে নিজের মনে! আর খাঁচার চন্দনাটাও ক্যাচর ক্যাচর করে উঠল আমাকে দেখে। এই মরেছে! সব্বাই মিলে আজ তাহলে ঝগড়া করবে না কি আমার সঙ্গে?

পড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়েই দেখি ভুতান। আমাকে দেখে একচোখ বুজে মস্ত একটা হাই তুললে। ঘুষি পাকিয়ে যত বলি, দুচোখ দেখা শিগ্‌গীর—ততই ও একচোখ বুজে একচোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

ভুতোনটা যে হিংসুটের রাজামশাই সে ত তোমরা জানই। কিন্তু চন্দনাটার কথা ভাব, ও শুধু শুধু ক্যাচর ক্যাচর করছে কেন বলতে পার?

তাই সকালবেলাটা মাটি হয়ে গেল আজকে। একটুও পড়া হল না!

বইপত্তর ফেলে ছুটলুম টুনুদের বাড়ি। টুনু আমাকে দেখেই বললে, তোকে আর কোনোদিন পেনসিল কাটা কল দিচ্ছি না—দেখেনিস।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, কেন রে?

টুনু তাড়াতাড়ি বললে, দেখবি কলটার কি করেছিস?

ঝগড়াটে মেয়েদের মতন হাত মুখ ঘুরিয়ে টুনু বললে, দাঁড়া একটুখানি, দেখাচ্ছি—

কিন্তু আমার তখন ভারি বয়ে গেছে দাঁড়াতে!

টুনু যেই ওদের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকেছে, অমনি আমি পাঁই পাঁই ছুট দিয়েছি পড়ি কি মরি। ছুটতে ছুটতে ছুটতে বাগানের সামনে আসতেই দেখি ভুতোন! পিঠ বাঁকিয়ে গোঁফ পাকিয়ে কাকে যেন তাগ করছে চুপি সাড়ে!

ওমা! ভাল করে চেয়ে দেখি কী মজা! বেলফুলের গাছের কাছটায় দুটো শালিক!

আর কি তখন চুপ করে থাকা যায়! চটাপট-পটাপট করে হাততালি দিয়ে দিলুম দু-তিনটে!

শালিক দুটো অমনি খুড়ুক-খুড়ুক-করে উড়ে পালাল। আর ভুতোনটা বোধহয় আমার ওপর রাগ করে সামনের পা দুটো দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটে, পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে একটা প্রজাপতির দিকে তেড়ে গেল।

আর আমি? আমি কি আর তখন দাঁড়াই!
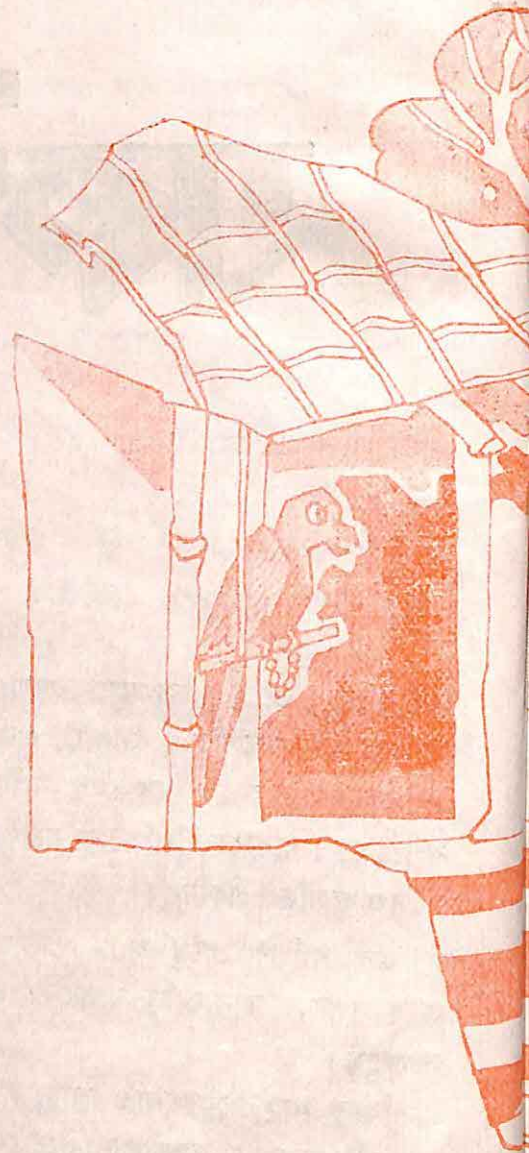
তাড়াতাড়ি ছুটলুম মায়ের কাছে। বললুম, বলো না মা দুটো শালিক দেখলে কী হয়?
মা বললে, কারো সঙ্গে ঝগড়া হয় না।

ব্যাস্! তখন আর কে পায় আমাকে! নাচতে নাচতে ছুটলুম টুনুদের বাড়ি! ঝগড়া করতে এবার কই আসুক না টুনু, দেখব কেমন করে ঝগড়া করে!

তোমরাই বলো, মায়ের কথা কি কখনো মিথ্যে হয়?
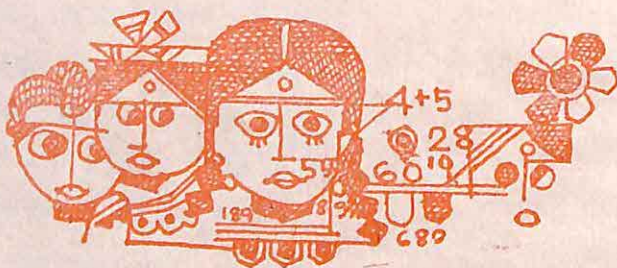
কাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের বাড়ির উঠোনে ঘাসের বনে ছপছপে জল জমেছে। কেমন মজা হয়েছে, তাই না। মাকে লুকিয়ে উঠোনে নেমে দিব্যি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেলা করে নিচ্ছি। খেলতে খেলতে একটা ঘাস ফড়িং ধরেছিলুম। আবার ছেড়ে দিয়েছি। টুনু বললে, ওর নাম গঙ্গা ফড়িং।

আমাদের বাড়ির কাছে গঙ্গা আছে। সাইকেল রিক্‌সায় চেপে আমরা সবাই একদিন বাপির সঙ্গে গঙ্গা চান করতে গিয়েছিলুম। টুনু একটা নৌকো নিয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে দিতেই তর তর করে কোথায় যে ভেসে ভেসে গেলে কে জানে।

সকালবেলায় দীপুদিদি এসেছে আমাদের বাড়িতে। বারে! জান না, দীপুদি হচ্ছে ঝুমুমাসির মেয়ে।

দীপুদিরা কলকাতায় থাকে। কলকাতায় বাপির আপিস। তপুদিদিরও কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। আমার কিন্তু কলকাতাকে একটুও ভাল লাগে না।

দীপুদি শুনে ত হেসেই খুন। ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে ট্রাম গাড়ি যায় ঘড় ঘড় করে। চারদিকে গলিঘুঁজি আর বড় বড় বাড়ি। জানলা দিয়ে রোদ ঢোকে না সহজে।

আমাদের এখানে ঘরে-দোরে রোদ থৈ থৈ করে। ফুরফুর করে হাওয়া আসে জানলা দিয়ে। মাথার ওপর ইয়া মস্ত একখানা আকাশ। সন্ধেবেলা চাঁদ উঠলে কুয়োতলাটা আলোয় ধবধব করে। কুয়োর জলে কেষ্টর মা আমাদের বাসন ধুয়ে দেয়। নিজেও চান করে। ভূতনি সহজে চান করতে চায় না। বৃষ্টিতেও ভিজতে দেখিনি কখনো!

আমাদের উঠোনে বেলফুলের গাছ। ঝিরঝিরে বৃষ্টির জল পেয়ে কদিন হল ফুল

ফুটেছে। জানলা খুললেই পুরনো একটা বাগান! কত গাছ আর পাখির মেলা ওখানে দীপুদিও দেখে অবাক!

আমি বললুম, তোমাদের কলকাতায় এত পাখি আছে? এত্তবড় আকাশ?

দীপুদি বললে, তোমাদের এখানে ট্রামগাড়ি আছে? হাওড়ার পুল? চিড়িয়াখানা? যাদুঘর?

আমি বললুম নেই ত নেই, তাতে কি? তোমাদের কলকাতায় আমাদের মতন এমন ইস্টিশন আছে, কৃষ্ণচূড়ার গাছ দিয়ে ঘেরা? বাড়ির সামনে শালুকফোটা পুকুর? বৃষ্টি হলে এমন ব্যাঙ ডাকে? জোনাক জ্বলে সন্ধ্যেবেলা?

দীপুদিদি এবার আমার কাছে হেরে গেল!

হাসতে হাসতে আমাকে একটু আদর করে সুন্দর একটা গান শুনিয়ে দিলে সবাইকে!

কী মিষ্টি গানের গলা দীপুদির!

আমরা কেউ পারলুম না ওর সঙ্গে।

টুনু বললে, যতই হোক দীপুদি কলকাতার মেয়ে, ওর সঙ্গে আমরা কখনো পারি?
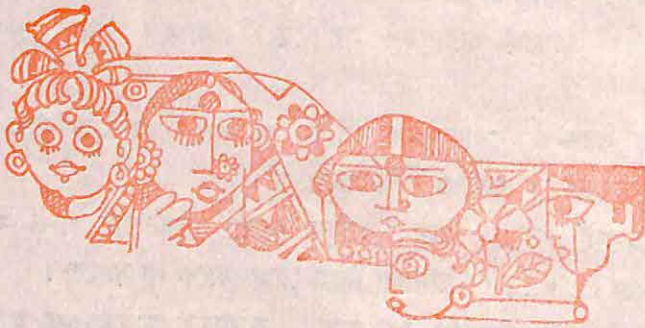
জান ত, সকাল থেকে পিংকিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁঠালতলার দিকটা আমি একবার খুঁজে এলুম। দেখি একটা কাঠবেড়ালি ল্যাজ তুলে নাচানাচি করছিল, আমাকে দেখে ছুট দিলে। একটা ফিঙে পাখি তিন্তিড়ি গাছের সরু ডালটার মাথায় বসে বসে দোল খাচ্ছিল। কিন্তু সে আমাকে দেখে কিছুই করলে না।

আর কাঠবেড়ালিটার কাণ্ড দেখ! আমাকে দেখেই ত ছুট দিলে। ওমা, তার ওপর কাঁটাল গাছের মগডালে উঠে আমাকে ভেংচি কেটে দিলে, চিক্ চিক্-চিক্কির্-চিক্।

আমিও ওকে একটা ভেংচি কেটে ওখান থেকে চলে এলুম। মা বললে, পিংকির জন্যে এবার একটা লোক রাখতে হবে দেখছি। বাপি ওসব কথায় কান দিল না। এখখুনি আপিস বেরুতে হবে কি না, তাই তাড়াতাড়ি চান করতে চলে গেল।

আমার তিন নম্বর প্রশ্নমালার আটের অংকটা কিছুতেই হচ্ছিল না! ইসকুলে গেলেই দিদিমনি ধরবেন। কিন্তু পিংকির জন্যে কি কিছু করার জো আছে?

টুনুদের বাড়ির সামনের মাঠটায় গেলুম।

না। ওখানেও পিংকি নেই!

কেষ্টর মা গজগজ করতে লাগল। চন্দনাটাকে ছোলা দেওয়া হয়নি এখনো। তার ওপর আবার পিংকির পাত্তা নেই সকাল থেকে! কে তাকে খুঁজবেরে বাপু! কার এত সময় আছে শুনি?

বাপি চান করতে করতে টুবলুদের বাড়ির কথা বললে! টুবলু আমাদের স্কুলে পড়ে। ওদের বাড়িটা বেশ ছোট। টালির ছাওয়া। সামনে এক টুকরো বাগান! টুবলুদের বাগানে টমেটো আর লংকার গাছ আছে। চন্দনাটা টুকটকে পাকা লংকা খেতে খুব ভালবাসে।

আমি একদম ঝাল খাই না! টুবলু নুন দিয়ে টমেটো খায়। পিংকি নুন খায় না। তবে টমেটো খেতে খুব ভালবাসে! টুবলুর হাতের লেখা খুব ভাল। রুলটানা খাতায় কেমন গোটা গোটা করে লেখে।

আমার হাতের লেখা দেখলেই দিদিমণি বলেন, কাগের ঠ্যাং?

তাই আমি এখন গোটা গোটা করে লিখছি! লেখার সময় কাগ দেখলেই তার ঠাংটার দিকে চেয়ে থাকি!

না! এখন আর একটুও মিলছে না তার সঙ্গে?

কিন্তু টুবলুর মতন হচ্ছে না কেন?

ভাবতে ভাবতে টুবলুদের বাড়ি ছুটলুম। ওদের বাগানে এখন আর একটাও টমেটো নেই। বেড়ার ধারে ছোট ছোট বেগুন গাছে ফুল ফুটেছে। বেগুনি সুতোর ফুল তোলা আমার একটা রুমাল আছে।

পিংকির একটাও রুমাল নেই। ওর শুধু একটা ঘণ্টি আছে। টুঙ্‌টুঙে ঘণ্টি!

টুবলু ঘুড়ি তৈরি করছিল।

পিংকির কথা শুনে বললে, না ত, তাকে আজ দেখিনি।

এমনি সময় টুনু এসে ডাকলে।

আমি বললুম, কি বলছিস?

ও বললে, তাড়াতাড়ি আয়। দেখবি চল তোদের পিংকির কাণ্ড। ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসেই দেখি আপিস যেতে যেতে বাপি ফিরে এসেছে পিংকিকে নিয়ে।

বললুম, ও কোথায় ছিল?

মা বললে, কেন, ভুতনিটার পাল্লায় পড়ে ওটাও এবার দুষ্টুর একশেষ হতে বসেছে!

বাপি বললে, ইস্টিশনে গিয়ে দেখি একটা বেঞ্চির তলায় চুপটি করে দুজনে বসে আছে!

টুনু বললে, ওমা, তাই নাকি? গাড়ি এলেই যদি উঠে পড়ত?

আমি বললুম, তাহলে কি মজাই না হত, নারে টুনু! দিব্যি কেমন কলকাতা চলে যেত ওরা?

বাপি বললে, কলকাতা বলে কলকাতা, একেবারে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে হাজির হত দুজনে।

টুনু বললে, সে ভারি মজা হত কেমন, তাই না?

মা একটু মুচকি হেসে দুটো মাছের কাঁটা এনে ভুতনির মুখের কাছে ছুঁড়ে দিলে! আর পিংকিকে বেঁধে রেখে এল কাঁঠালতলায়। ওর জন্যেই আজ আর আপিস যাওয়া হল না বাপির।

আমি কিন্তু ইস্কুল বেরিয়ে পড়লুম খেয়ে-দেয়ে! যাবার সময় পিংকিকে একটা বিস্কুটের থেকে আধখানা দিয়ে গেলুম! দিব্যি কেমন কুড়মুড় করে খেয়ে নিলে!

টুবলু শুনে বললে, ছাগলছানা আবার বিস্কুট খায় নাকি ?
আমি বললুম, পিংকি আমাদের ভারি লক্ষ্মী ! ও সবকিছুই খায়।
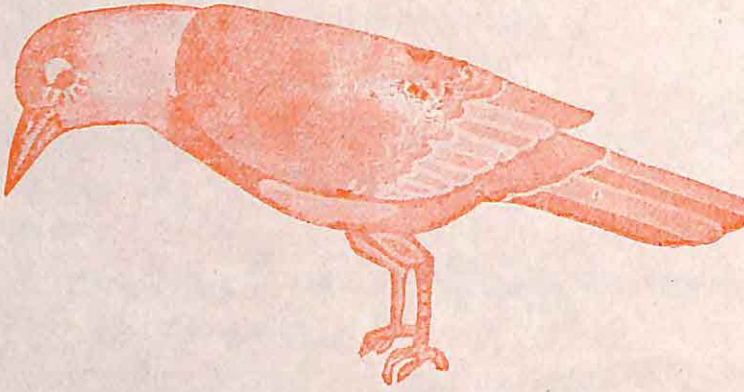
কাল আমাদের কুয়োতলায় চুরি হয়ে গেছে। কিন্তু কেষ্টর মা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না সে কথা। ও বলে, সাত-সক্কালে চোর আসবে কোত্থেকে? টুবলুও শুনে বললে, চোর ত রাত্রে চুরি করে শুনেছি। দিনের বেলায় ঘুমোয়।

টুনুবললে সব চোর দিনের বেলায় ঘুমোয় না।

আমিও বললুম টুনু ঠিক বলেছে। চোরেদের ঘুম পায় না। নাহলে দুপুর বেলা মেজোমাসিদের বাড়ির সবাই যখন ঘুমুচ্ছে, তখন কি না চোর এসে একটা ভিজে শাড়ি তুলে নিয়ে গেল উটোন থেকে।

টুনুরও তখন অনেক রকম চুরির গল্প মনে পড়ে গেল। ও বললে, কেন, সেবার আমার ছোটকার একটা নতুন ছাতা চুরি গেল বাস থেকে। তখন বেলা আর কত হবে—দশটা কি সাড়ে দশটা! পাশে রেখে টিকিট কাটতে যা সময় গেছে মাত্তর, সেই ফাঁকেই ছাতা সমেত চোর হাওয়া।

টুবলুরও অনেক চুরির গল্প মনে পড়ছিল এবার। ও বললে, কিন্তু কুয়োতলায় অত বাসন কোসন পড়ে থাকতে চোর কি না সামান্য ঝিনুক-বাটি নিয়ে পালাল!

কিন্তু মায়ের মনটাই বেশী খারাপ হয়ে আছে সেই থেকে। মা বললে, টুপুর এখন কিসে দুধ খাবে বলত কেষ্টর মা?

টুপুরের দুধ খেতে কষ্ট হবে শুনলে আমার মনটাও বড্ড খারাপ হয়ে যায়। ও আমার ছোট্ট বোন কি না! এখনো যে চুমুক দিয়ে দুধ খেতে শেখেনি। সেই জন্যেই ত সব্বাই মিলে খুঁজছিলুম ওর ঝিনুক-বাটি।

মা বললে, ও আর খুঁজে কি হবে, নিশ্চয় চুরি হয়ে গেছে।

কেষ্টর মায়ের মনটাও খারাপ হয়ে গেল শেষকালে। ও বললে, কিন্তু চোর কখন এল কালকে। পোড়া চোখে একটু দেখতেও পেলাম না গো!

আমি বললুম, চোরকে আবার দেখতে পাওয়া যায় না কি? টুনু বলছিল, চোরেরা নাকি হাওয়া হয়ে যায় চুরি করে!

মা বললে, টুপুরের মুখেভাতের সময় ঐ ঝিনুক-বাটিটা দিয়েছিল ওর সেজ মামা। ছোটর ওপর কি সুন্দর দেখতে ছিল।

Acc No-14990

বাপি বললে, চোরটার নিশ্চয়ই টুপুরের মতন একটা মেয়ে আছে তাহলে! আর এটাও হতে পারে, তার মেয়ের মামাবাড়ি থেকে কেউ একটা ঝিনুক-বাটিও দেয়নি মুখেভাতের সময়। আর সেই রাগেই হয়ত আমাদেরটা নিয়ে পালিয়েছে!

আমি বললুম, চোরদের আবার মেয়ে আছে নাকি! ইস্! যত্তসব আজগুবি কথা!

বাপি শুনে হেসে ফেললে হো হো করে। টুনুকে বলতে টুনুও আমার কথায় সায় দিলে! চোরেদের কেউ কোথথাও থাকে না। থাকলে কি আর এমন করে চুরি করত না কি ওরা? বাব্বাঃ! বকুনি খেত না তাহলে?

টুবলুও বললে, আমার এক পিসেমশাইও পুলিশে কাজ করেন। তাঁর মুখে শুনেছি—চোরদের আর কি আছে? কিচ্ছুই নেই! আছে শুধু বুদ্ধি!

কাল থেকে তাই আর কুয়োতলায় যেতেও পারছি না একা একা!

আজ সকালে টুবলুর মা-ও
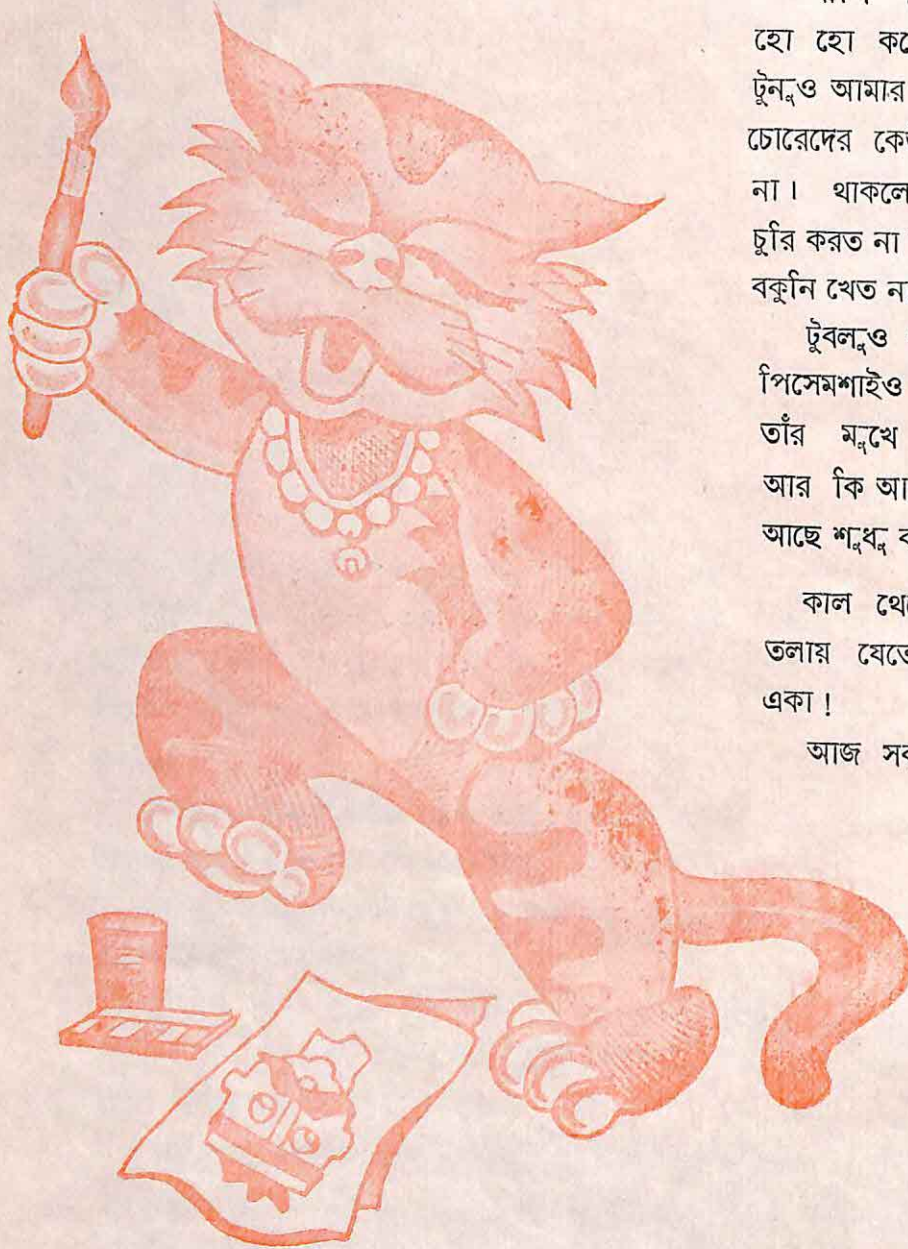
বলে গেল, ওদের একটা ভাল চামচেও পাওয়া যাচ্ছে না পরশু থেকে। টুপসির মেজপিসিমাও বললেন, কালকে ওঁদের একটা গায়ে মাখা সাবান কলতলা থেকে চুরি গেছে।

কেষ্টর মা একটুতেই গজগজ করে। তাই বললে, এ আবার কি দিনকাল এল কে জানে! এমন চোরের কথা ত কোনদিন শুনিনি।

দুপুরবেলা জানলার ধার থেকে তাই সব বই-পত্তর সরিয়ে নিলুম আমার। বাপির টেবিল থেকে কালো পেনসিলটা নিয়ে একটা ছবি আঁকতে যাব, ওমা! ভুতনিটা কোথায় ছিল ল্যাজ ট্যাজ তুলে ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল। ইস্! ভিজে বেড়ালটির মতন মুখ করে ভাব করতে এলে কি হবে—ওর ছবি আঁকতে আমার ভারি বয়ে গেছে। আমি এখন চোরের ছবি আঁকব একটা। ইয়া বড় বড় চোখ, খোঁচা খোঁচা চুল—আর গোঁফ থাকবে না বুঝি? বারে! গোঁফ না থাকলে সে চোর হয় কখনো!

এদিকে গোঁফ উঁচিয়ে ভুতনিটা হঠাৎ ম্যাও করে উঠল। কিন্তু ম্যাও করলে কি হবে, বাপি ছাড়া সব্বাই বিশ্বাস করে ভুতনিটাও দু-একটা মাছ ভাজা সরায় সুযোগ পেলে।

এমনি সময় কোত্থেকে একটা কাগ এসে বসল পাঁচিলে। বসেই বললে, কা—কা!

যেন গায়ে পড়ে ভুতনিকে জিগেস করছে. কী হয়েছে, এ্যাঁ? কিন্তু ভুতনি হচ্ছে বাপির আদুরে বেড়াল, সে ত পাত্তাই দিলে না কাগটাকে। ব্যাপার স্যাপার সুবিধের নয় দেখে কাগটা হঠাৎ উড়ে গেল হুস্ করে।

তারপর আমি চোরের একটা লম্বা মুখ আর চ্যাপ্টা নাক এঁকে যেই না চোখ দুটো গোল গোল করতে গেছি অমনি শুনি টুবলু, টুনু আর টুপসিদের গলা। চো র—চো—র……

চোরের নাম শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে দেখি টুনুর ছোটকাকার পিছন পিছন টুবলুও ছুটছে ওর গুলতিটা নিয়ে। আমাকে দেখেই টুনু বললে, দিন-দুপুরে ছোটকার নতুন পেনটা কি না টেবিল থেকে নিয়ে পালাচ্ছে……

ওমা! তাই ত! পাঁচিলে বসা সেই কাগটাই দেখি চকচকে পেনটা মুখে করে উড়ে যাচ্ছে ওর তেঁতুল গাছের বাসার দিকে।

তারপর যে কী কাণ্ড হল সে আর কি বলব। টুনুর ছোট্কা গাছে উঠছে দেখে অন্য কাগেরাই কা—কা—খা—খা করে তেড়ে গেল সেই কাগটাকে। দেখে ত আমরা অবাক!

বাপি শুনে বললে, কাগেরা কি আর সবাই খারাপ হয়?

এদিকে টুনুর ছোট্কা কাগের বাসা থেকে নেমে আসতেই পেনটার সঙ্গে টুপুরের সেই ঝিনুক-বাটি আর টুবলুদের চামচেটাও পাওয়া গেল। শুধু পাওয়া গেল না টুপসিদের সেই সাবানটা।

টিংকু বললে, ওটা নিশ্চয়ই কাগটা মেখে ফেলেছে।

আমাদের কিন্তু বিশ্বাস হল না সে কথা। তোমরাই বলো, সাবান মাখলে কাগটা একটুও ফর্সা হত না বুঝি?

সকাল সকাল উঠে পড়েছি আজকে। মা রোজ ফার্স্ট হয়। ভুতানিটা সেকেণ্ড। আজ সে এখনও খাটের তলায় শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ঠিক হয়েছে। আজ একেবারে থার্ড হয়ে গেছে ভুতানিটা।

হোক গে। ওর আর কি! ও হচ্ছে বাপির আদুরে বেড়াল।

ওর ত আর বেবী মাসি আসবে না আজকে!

আমার এখন অনেক কাজ। বই-টই গুছিয়ে বাগানে যেতে হবে। বাগানে এখনো রোদ আসেনি। না আসুক। যা হোক একটা ফুল তুলে রাখতে হবে বেবী মাসির জন্যে। চন্দনাটা সব শুনে আসছে কাল থেকে। ভুতানিটা বোধহয় শোনেনি।

টুবলু বলেছে, বেবী মাসির কাছে কঠিন অংকগুলো এবার আমরা শিখে নেব।

টুনুর একটাও মাসি নেই। তাই বেবী মাসি এলেই টুনু বলেছে ছুটে আসবে আমাদের বাড়ি। টুপসিকে আনবে না। টুপসিটা বড্ড হাসে।

বেবী মাসি তমলুকে পড়ে। অংকে একশোতে একশো পায় প্রতিবার। সেই নিয়ে মায়ের কত কথা। দিনরাত্তির আমাকে বকুনি! তাই এবার সরস্বতীর কাছে মনে মনে বলেছি, হে মা, আমি যেন ঠিক আমার বেবী মাসির মত হই।

দেখতে দেখতে ন'টা বেজে গেল।

টুনু সকাল থেকে দুবার এসেছে।

টুবলু এসে বললে, কইরে ? তোর বেবী মাসি কখন আসবে ?

আমি বাপির কাছে গেলুম। বাপি বাজার থেকে ফিরেছে এই মাত্র। ভুতনিটা সকাল থেকেই ঘুরঘুর করছে রান্নাঘরে। মা সুক্তো রান্না করেছে আজকে। বেবী মাসির সঙ্গে রাঙা মামাও আসবে কিনা। রাঙা মামা নাকি সুক্তো খেতে খুব ভালবাসে।

বেবী মাসি আমার জন্যে একটা কলম আনবে লিখেছে। মায়ের জন্যে তমলুকের গয়নাবড়ি। সে ভারি মজার। ভাজা হয়ে গেলে খেতে মন চায় না একদম। পরতে ইচ্ছে করে দু'হাতে।

ইস্, টুনুটা গয়নাবড়ি কখখনো খায়নি।

দাশটা বাজতেই আবার বাপির কাছে গেলুম। খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই বাপি বললে, এখনো অনেক গাড়ি আছে ওদের আসার।

টুনু বললে, চুপি চুপি স্টেশনে যাবি ?

আমি মায়ের কাছে গেলুম। মা বললে, এক্ষুণি এসে পড়বে। হাঁপাচ্ছিস কেন ?

ভুতনিটা ঠিক হাঁ করে সব শুনে নিলে।

চন্দনাটার এসব দিকে কান নেই। পিংকিটাও কাঁঠালতলায় ঘাস চিবুচ্ছে দেখলুম। ছাগলছানা হলে কি হয়, ভারি লক্ষ্মী।

দশটা বাজতেই বাপি বারান্দা পেরিয়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

মা বললে, বেবী মাসি এলেই নেচ না। ভাল করে অংকটংক শিখে নিও।

টুবলু এসে একটা পালক দিয়ে গেল। কি সুন্দর। কত রঙের কাজ করা পালকটায়।

আমি বললুম, এটা কি হবে ?

টুবলু বললে, কেন, বেবী মাসি এলে দিবি।

টুনুর খুব আনন্দ সেই দেখে। ও বলে, দুপুরবেলা আমাদের টোপা কুলের আচার আনব বেবী মাসির জন্যে। আমি শুধু একটা কাঁঠাল-চাঁপা ফুল তুলে টেবিলে রেখে দিয়েছি সকালবেলা।

কিন্তু দুপুর পেরিয়ে গেল। বেবী মাসি এলই না। মা বললে, তোরা সবাই খেয়ে নে। ওরা হয়ত বিকেলেই আসবে।

খেতে ভাল লাগল না একদম। তবু কোনরকমে খেয়ে উঠলুম। হঠাৎ চন্দনাটা চেঁচিয়ে উঠল, কে ? কে ?

মা বললে, ঐ ত রাঙা এসে পড়েছে, রাঙা……

আমি বললুম, বেবী মাসি কোথায় ?

রাঙা মামা নিচু হয়ে জুতো খুলতে খুলতে বললে, এবার আর তার আসা হল না—

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

মা বললে, কেন? তার আবার কি হল?

রাঙা মামা জামাটা খুলতে খুলতে বললে, ওদের স্কুল থেকে কালকে ওরা দীঘা বেড়াতে গেছে সবাই।

আমি আর রাঙা মামার সামনে দাঁড়াইনি।

চোখ ফেটে জল আসছে আমার। টুনু আর টুবলুকে আমি কি বলব?

তোমরাই বলো, বেবী মাসির ওপর কার না রাগ হয় এখন?
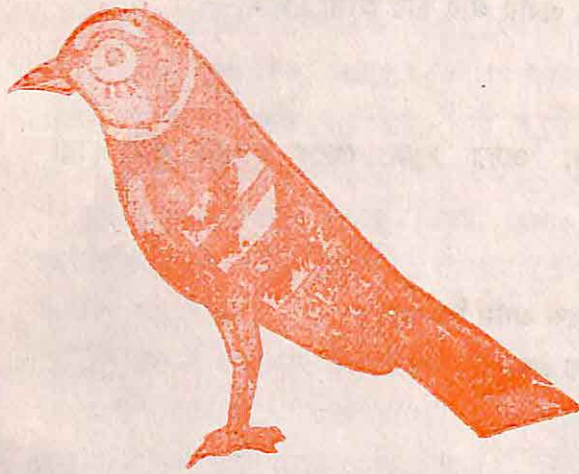
বারান্দায় বসে বসে বানান মুখস্থ করতে যাব কি ভুতনিটা এসে বসে থাকবে মুখের সামনে। তোমরা জান না, ও ভারি হিংসুটে হয়েছে আজকাল। বাপিকে বললেও বিশ্বাস করে না। টুনু দেখেছে। কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে একটু গল্প করব কি, সামনে এসে দাঁড়াবে পিটে ল্যাজ তুলে। বকলেই মিঁউ মিঁউ করে চোখ বুজে কাঁদবে।

ছবি আঁকার খাতায় কালকে একটা ছবি এঁকেছি পিংকির। কাউকে দেখাইনি। আসলে ওর কানদুটো ভাল হয়নি তেমন। হবে কি করে? রং তুলির বাকসো খুলে একটু বসব কি, ভুতনি এসে গ্যাঁট হয়ে বসবে সামনে। কিন্তু কালকে পিংকির ছবিটা ও দেখতে পায়নি। এসেওছিল একবার। তখন কান দুটো আঁকছিলুম। ওকে দেখেই লুকিয়ে রেখেছি।

শীগ্‌গীর গরমের ছুটি পড়বে আমাদের। তখন বড়পিসিদের বাড়ি বেড়াতে যাব। ফুলতুলিতে ওরা থাকে। আমাদের ইস্টিশন থেকে সেখানে একটাও গাড়ি যায় না। বাসে করে যেতে হবে। বাস থেকে নেমে রিস্কায়।

ফুলতুলিতে একটা নদী আছে। বড়পিসিদের বাড়ির সামনেই। কি সুন্দর আঁকা-বাঁকা নদী। জলের তলায় চিকচিকে বালি। গরমের দিনে সেই বালিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে বড্ড ভাল লাগে। আমি অবশ্য কখনো যাইনি। ভাঁড়ু আমাকে লিখেছে। ভাঁড়ু আমার বড়পিসির বড় মেয়ে। আমার চেয়ে এক ক্লাস নিচুতে পড়ে। খুব বর্ষায় নদী থৈ-থৈ করে জলে। তখন পালতোলা নৌকো যায় কত। ভাঁড়ু নাকি একটা নৌকোর ছবি এঁকে রেখেছে আমার জন্যে। তাতে পাল তোলেনি এখনো। পিসেমশাই নাকি ছবিটা দেখে খুব হেসেছেন। সেই নিয়ে ভাঁড়ুর ভারি রাগ। কে জানে, ছোটদের ছবি দেখে বড়রা অত হাসে কেন শুধু শুধু।

সকাল থেকে পড়া লেখায় মন বসছে না একটুও। ভ্যাপসা গরমে এখন শুধু আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করে অনেক। কিন্তু মায়ের জন্যে দুটো খাবার উপায় নেই। খেলেই নাকি অসুখ করে।

সামনেই আমাদের পরীক্ষা। তাই এই সময় অবশ্য সাবধানে থাকতে হবে একটু। কিন্তু থাকব কি, ভুতনিটার বোধহয় হাঁচির ব্যামো ধরেছে কদিন। কোথাও কিছু নেই, ভূগোল বইটা খুলতে যাচ্ছি—দিল মুখের সামনে একটা হেঁচে। টুনু বলেছে, টুবলুও বলেছে, বেড়ালের হাঁচি নাকি ভাল না। অসুখ করে।

সকালবেলা আজ আবার কোথা থেকে দুটো চড়ুই এসে জুটেছে বারান্দায়। ছোটকার ঘরের ঘুলঘুলিটায় আসা যাওয়া করছে বারবার। মনে হয় বাসা বাঁধবার জন্যে ফন্দি আঁটছে। কিন্তু পছন্দ হয়েছে কিনা কে জানে। মিটিরমিটির করছে দুজনেই।

আমি বকে দিলাম। সামনে আমার পরীক্ষা না? যা এখান থেকে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! মা এসে বকে দিয়ে গেল দু'দুবার। ইংরেজীর বানানগুলো ভাল করে মুখস্থ না হলে মুশকিল। আপিস থেকে ফিরেই বাপি এসে ধরবে। তখন যদি একটা ভুল হয় তাহলেই ভাব, বাপি কেমন বকা দেবে আমাকে! তার চেয়েও বড় কথা, ঐ ভুতনিটা তখন একপাশে শুয়ে শুয়ে সব দেখবে কিনা।

নিচের বাগান থেকে একবার ঘুরে এলুম। বেলফুলের গাছটায় একটু জল দিতে হবে বিকেলবেলায়। এখন একটু বরং পড়ে নিই। কিন্তু চড়াই দুটো শুনল না। সমানে সেই কিচির মিচির করতে লাগল বারান্দার রেলিঙে বসে বসে।

আমি বিনুনিদুটো ঠিক করছিলুম একমনে। সবুজ ফিতের একটা ফুল কখন যে খুলে গেছে দেখিনি। হঠাৎ মা এসে দাঁড়াল পিছনে।

আমি বললুম, দেখ না, বানান মুখস্থ করব কি—কোথা থেকে দুটো চড়ুই এসে চেঁচামেচি করছে সমানে।

মা উল্টে বকে দিলে আমাকে। কি ভাগ্যস কান মলাটা খেতে খেতে একটুর জন্যে বেঁচে গেলুম। আমি নাকি ফাঁকিবাজ মেয়ে। মায়ের কথা শুনে চোখ দুটো ছল্‌ছল করে এল। কিন্তু কাঁদতে পারলুম না। চড়ুই দুটো দিব্যি মজা করে তখন মিটমিট করে আমার দিকে চেয়ে বোধহয় হাসছিল। আমি মনে মনে বললুম, দাঁড়া, মা আগে যাক—তারপর মজা দেখাচ্ছি তোদের।

কিন্তু কি মজা জান, মা একটু আড়াল হতেই রেলিঙ থেকে নেমে যেই না চড়ুই

দুটো নাচতে গেছে অমনি কোথায় ছিল ভুতনি, গোঁফ পাকিয়ে, ল্যাজ তুলে ঝুপ করে লাফিয়ে এসে পাকড়ে ফেললে একটাকে।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধরলুম ওকে।

বললুম, ছাড় ভুতনি,—ছাড়—ওকে মারিস না, ছেড়ে দে—

কিন্তু সহজে কি দুষ্টু চড়ুইটাকে থাবা থেকে ছাড়তে চায় ভুতনি। আমি আর কি করব, বেচারি চড়ুইটার কাঁদো কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে আমি একটু আদর করে দিলুম উল্টে। ছেড়ে দেবার সময় বললুম, আর যেন দুষ্টুমী করিস না কখনো, এখানে ভুতনি আছে আমাদের।

চড়ুইটা উড়ে গিয়ে ঘুলঘুলিতে বসার পরেও রাগে ফোঁস ফোঁস করে ফুলতে লাগল ভুতনি। ম্যাঁও ম্যাঁও করে দু-একবার কি বলতে চাইল ঠিক বোঝা গেল না। মনে হল ও যেন বলছে, পরীক্ষার পড়ার সময় আর গোলমাল করবি কোনদিন ?

সত্যি, ভুতনিটাকে যা ভেবেছিলুম তা নয়। ও আমাকে সত্যিই ভালবাসে।
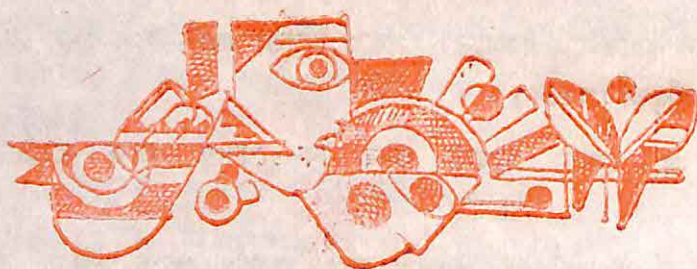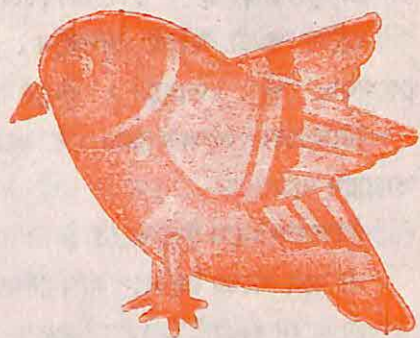
টুনুকে কালকেই দেখিয়েছিলুম।

টুবলু দেখেনি। ভাঁড়ুর মুখে শুনে গেছে।

কালকেও বাপি একটা ডাকটিকিট এনে দিয়েছে নতুন। পাখির ছবি আঁকা তাতে। এখনো আঁটা হয়নি খাতায়। বাপি বলেছে, ওটা নাকি ভুটানের।

টুনুর কাকু একবার ভূটানে গিয়েছিল। আমি ভুটানিদের দেখেছি। কলকাতায় ভুটানিরা শীতকালে সোয়েটার বিক্রি করতে আসে। ওদের দেশটা নাকি খুব সুন্দর দেখতে। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। গায়ে গায়ে ঘর বাড়ি, বাগান আর ঝরনা। যেন একটা ছবি।

টুবলুর একটা ভাগনা আছে। তার নাম ভুটান। ভাঁড়ু তাকে দেখেছে। সে নাকি খুব দুষ্টু। সব সময় তার হাতে একটা গুলতি থাকে। কাগেরা দেখলেই হুস করে সরে পড়ে। কাছে পিঠে থাকে না।

জান ত, কালকে আমরা কলকাতা যাব। কালটুর জন্যে একটা কলম আনতে দিয়েছে কাকীমা। আমি আর এবার কিছু কিনব না! তারচে ইস্টিমার চড়ব গঙ্গায়। কাগজের কাপে একটা আইস্‌কিরীম। বাপিকে চুপি চুপি বলে রেখেছি। মা শুনলে বকবে কি না!

ভুতনিটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে কোনরকমে। কিন্তু বুঝলে কি হবে, ওকে ত আর কেউ কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে না। তাই ওর একটু হিংসেও হচ্ছে মনে মনে!

সব সময় মায়ের কাছে ঘুরছে! আমার কাছে আসছে না সকাল থেকে। আমি দুধ খেলুম। আড় চোখে দেখে নিয়ে চলে গেল। আমি বিস্কুট খেলুম। ও এল না। মুখ ঘুরিয়ে মোড়ার ওপর শুয়ে রইল।

আমি বললুম, তবে রে। আমার কাছে না আসবি ত ভারি বয়েই গেল। ওকে শুনিয়ে মাকে বললুম, দেখবে নাকি আমার নতুন টিকিট। কী সুন্দর একটা ভুটানের পাখি! বাপি এনে দিয়েছে কালকে।

মা অমনি বললে, কই নিয়ে আয়ত দেখি।

কিন্তু কি কাণ্ড! সেই টিকিটটা কোথায়?

বাংলা বইটা খুঁজে দেখলুম। বিজ্ঞান বইটায় রাখিনি। তবু দেখে নিতে ইচ্ছে হল। না। কোত্থাও নেই। তাহলে? টুনুর কাছে ছুটলুম।

টিকিটটার জন্যে আমার যে কান্না পাচ্ছে এখন। হারিয়ে গেলে কি হবে? কিচ্ছু ভাবতে ভাল্লাগে না।

টুবলুকে নিয়ে টুনু ছুটে এল। পাশের বাড়ির কালটু এসে সন্দেহ করলে ভুতানিকে।

না বলে পরের জিনিসে মুখ দেখার ভারি একটা খারাপ অভ্যেস আছে ভুতানির।

মা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলে।

টুবলু বললে, দাঁড়া। বুলটেকে ডেকে নিয়ে আসি। গাবলু ওর সঙ্গে পড়ে। সে নাকি গোয়েন্দা হবে বলে একটা নোটবুক কিনেছে কদিন হল।

আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলুম। সেই ভাল। টুবলুর দারুণ বুদ্ধি। ভুতানিটা গোয়েন্দার হাতে গেলে খুব মজা হবে।

বুলটেকে আমি দেখেছি। ও আমাদের বুবুনের ছোট্‌দা। কিন্তু গাবলুকে কখনো দেখিনি। দুপুরবেলাই টুবলুর সঙ্গে এই প্রথম এল আমাদের বাড়ি।

এসেই পকেট থেকে একটা নতুন নোটবুক আর পেন্সিল বার করে বললে, কি হারিয়েছে তোমার?

আমি বললুম, একটা ডাকটিকিট। বাপি এনে দিয়েছিল কালকে।

গাবলু ভুতানির দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে বললে, কোথাকার?

—ভুটানের! টুনুই তাড়াতাড়ি বললে, কী সুন্দর একটা পাখির ছবি ছিল তাতে!

গাবলু হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে যেন কি দেখে নিলে। তারপর বললে, আচ্ছা—ঠিক আছে!

বলেই বুলটেকে নিয়ে একবার বাইরে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন গেল টুবলু। আমরা গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালুম।

হঠাৎ টুবলু ছুটে এসে বললে, কাদের মই আছে বলত?

আমি বললুম, মই ত নেই। আমাদের একটা ছোট টেবিল আর দুটো মোড়া আছে শুধু।

গাবলু বললে, ঠিক আছে। তাতেই হবে।

বারান্দা থেকে ছোট টেবিলটা টানতে টানতে আমাদের বড় ঘরে নিয়ে এল টুবলু। বুলটে তার ওপর একটা মোড়া বসিয়ে দিলে!

টুনুতে আমাতে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এসব দিয়ে এবার কি হবে বুঝতে পারছি

না। বেগতিক বুঝতে পেরে ভূতনিটা সরে পড়েছে কখন কেউ খেয়াল করিনি।

তড়াক করে গাবলু হঠাৎ টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর মোড়ার ওপর। টুবলু আর বুলটে ভাল করে ধরে রইল মোড়াটাকে।

গাবলুর হাতটা হাওয়া-ঘুলঘুলির দিকে যেতেই দুটো চড়ুই ফুড়ুক করে উড়ে পড়ল! আমরা ত হাঁ হয়ে গেলুম।

গাবলু একমুঠো টুকরো কাগজ নিয়ে নেমে এল। যত রাজ্যের বাসের টিকিট সব। তার মধ্যেই হঠাৎ উঁকি দিয়ে উঠল একটা পাখির ছবি। হ্যাঁ! ঐ ত, আমার সেই ভুটানের ডাকটিকিটটা!

টুবলু বললে, দেখছিস কাণ্ড! চড়ুইরা কেমন চোর হয়েছে আজকাল।

টুনু হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে! নোটবুকটা খুলে খস খস করে কি যেন লিখে রাখলে গাবলু। টুবলুও দেখতে পেলে না।

বোধহয়, এই প্রথম চড়ুইদের নামটা গোয়েন্দার খাতায় উঠে গেল। তা যাকগে। তোমরা কিন্তু এই নিয়ে আবার বেশি হৈ-চৈ করো না।

জানই ত, ভুতনিটা বড্ড হিংসুটে। এমনিতেই ও চড়ুইদের দেখতে পারে না কখখনো!
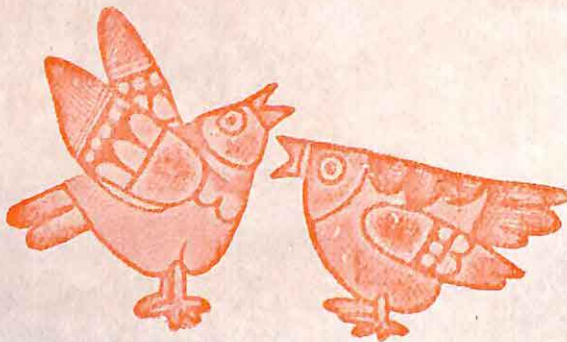
বানিয়ে বানিয়ে

ইস্‌কুল থেকে লিখতে বলেছে আমাদের।
যার যা ইচ্ছে লিখতে পারে! কিন্তু মন থেকে। বানিয়ে বানিয়ে। ভাল হলেই ছাপা হবে ইস্‌কুলের ম্যাগাজিনে।
টুনু একটা ছড়া লিখে ফেলেছে কালকে। নিজে নিজে। আমাদের পিংকি বলে ছাগলটাকে নিয়ে।

পিংকি, পিংকি—
কান দুটো ঝোলা ঝোলা
ভালবাসে রিংকি।
পিংকি একটা ছাগল—
সবাই বলে পাগল ॥

টুবলু বলেছে ভালই হয়নি। কিন্তু বাপি শুনে বললে, দারুণ হয়েছে ছড়াটা। পাপুই এদিকে সবাইকে কানে কানে বলে বেড়াচ্ছে, ছড়াটা নাকি টুনুর ছোটমামা লিখে দিয়েছে। মুন্নি আর টিংকুরা অবিশ্যি বিশ্বাস করেনি ওর কথা।

আমিও কাল থেকে অনেক চেষ্টা করছি একটা লিখতে। কিন্তু পারিনি। বাপিকে গিয়ে বললুম। বাপি বললে, বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখতে হয় আর মিলিয়ে মিলিয়ে ছড়া।

আমি যে আবার মিল দিতে পারি না টুনুর মতন। তারচে বানিয়ে বানিয়ে বরং গল্পই লিখব একটা। কিন্তু কেমন করে যে লিখতে হয় কি করে জানব।

বাপি বললে, কি ভাবছ, পারবে না ?

আমি হেসে ফেললুম। বললুম, বলে দাও না কেমন করে বানায়।

বাপি খবরের কাগজটা সরিয়ে রেখে বললে, ধরো, একটা হাতি ছিল। আর ছিল তার এক নাতি। সে থাকত কলকাতার চিড়িয়াখানায়। একদিন হল কি, ঝমঝম করে সারা দুপুর খুব বৃষ্টি হল। রাস্তা-ঘাটে সবাই রঙচঙে ছাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু হাতির সেই নাতি—তার কি হল ?

আমি বললুম, তার আর কি হবে, খুব মজা হল সেই দেখে। বাপি বললে, না, না। এইত ভুল হল। তা হবে কেন—হাতির সেই নাতিটার খুব মনটা খারাপ হয়ে গেল! তারপর হঠাৎ একসময় সে কেঁদে উঠল ফুঁসফুঁস করে। বললে, আমার ছাতি কোথায় ? ছাতি ?

আমি বললুম, তারপর ?

বাপি বললে, তারপর তুমি বানিয়ে নাও মন থেকে।

কিন্তু হাতির গল্পটা ভাল লাগল না তেমন। তাই ছেড়ে দিলুম।

মা বললে, ভুতনিকে নিয়ে একটা লিখতে পারিস !

ভুতনি বাপির বাহারের মোড়াটার ওপর শুয়েছিল, বুঝতে পেরেই উঠে এল আমার কাছে।

আমি বললুম চুপ করে বোস। তোকে নিয়ে একটা গল্প লিখব আমি।

ভুতনি অমনি বড় করে একটা হাই তুলে থাবা বাগিয়ে বসে পড়ল।

কিন্তু ভুতনিকে নিয়ে কি বানাই এখন! ভাবতে ভাবতে প্রথম লিখলুম,

ভুতনি আমাদের বাড়িতেই থাকে, ও হচ্ছে বাপির আদুরে বেড়াল। ও একদিন আমার দুধ থেকে চুরি করে এক চুমুক খেয়ে নিয়েছিল। সেই থেকে মা আর ওকে বিশ্বাস করে না। চোখে চোখে রাখে।

এইটুকু লিখেই একবার পড়লুম। দুবার পড়লুম। তবু ভাল লাগল না। তাই কেটে দিলুম খচখচ করে। খাতার আর একটা নতুন পাতায় শুরু করলুম আবার।

একটা ছিল বেড়াল। সবাই ডাকত ভুতনি। তার ছিল একটা বন্ধু। কালো কুচকুচে একটা কাগ। ভুতনি ছিল যেমনি হ্যাংলা, কাগটা ছিল তেমনি ক্যাংলা। সব সময় কা-কা করত, এঁটো-কাঁটা নোংরা-ঝোংরা খেয়ে মরত। একদিন কি হল—

কি যে হল ভাবতে লাগলুম আবার। লিখতে লিখতে ঘেমে গেলুম। আর বানাতে পারলুম না। কলম কামড়াতে কামড়াতে মেঝেতেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে যদি লেখা হয়।

কিন্তু হল না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভুতনি বোধহয় সরে পড়ল। পড়ুকগে। ওকে নিয়ে আর গল্পই বানাব না কোনদিন। ভারি বয়ে গেছে আমার। এত কিসের দায়। ওকে নিয়ে লিখলে ওরই ত মজা হত কেমন! ছাপা হত ওর কথা। ওর নাম। সবাই ওকে চিনে ফেলত দিব্যি। মরুকগে। আমার আর কি? ও পালাল ত ভারি বয়েই গেল। আমি না লিখলে সাতজন্মে ভুতনির নামটা কখনো ছাপা হবে ভাবছ কাগজে! হুঁ! তাহলেই হয়েছে!

ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ভুতনিকে নিয়ে লেখাটা কাটতে যাচ্ছি, এমন সময় টুনুরা এসে পড়ল হৈ হৈ করে।

টুপসি বললে, এই দেখ মিঠিন—আমিও একটা লিখে ফেলেছি বানিয়ে।

টুনু খুশিতে ডগমগ হয়ে বললে, সত্যিরে, টুপসির গল্পটা শোন, কি সুন্দর হয়েছে।

রিংকি তাড়াতাড়ি বললে, বাংলার দিদিমনি শুনে বলেই দিয়েছেন, টুপসিরটা এবার ছাপা হবেই!

আমিও শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। টুপসির গল্পটা ছাপা হলে কি মজা হবে আমাদের। টুপসি যে এক ক্লাসের বন্ধু আমার!

টুনু বললে, গল্পটা আগে শোন না, কি মজার!

টুপসি ওর হাতের লেখার খাতাটা খুলেই শুরু করে দিলে পড়তে।

ভাঁড়ুকে ইসকুলের ভাত দিতে গিয়েই ওর মা চেঁচিয়ে উঠল। —এইরে, মরেছে! ও ছোটবৌ, ও মোতির মা, তোরা কোথায় সব বাইরে কি করছিস?

ভাঁড়ুর ছোটকাকীমা ছুটে এল বারান্দা পেরিয়ে। মোতির মা কাপড় দিতে ছাদে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

ভাঁড়ুর মা বললে, আমাদের মাছ ত সব ঝালে দিয়েছি! কিন্তু ভাঁড়ুর জন্যে রাখা সেই ভাজা মাছটা কই?

মোতির মা গালে হাত দিয়ে বললে, ইস কি অলক্ষুণে কথা বলো দিকিন। আস্ত একটা পেটির মাছ···

ভাঁড়ু বললে, মা—মা—ঐ দেখ পাঁচিলে বসে কাগটা কেমন পিট পিট করে আমাকে দেখছে।

মোতির মা একটা ঝাঁটা হাতে কাগটাকে তেড়ে গেল। বললে, ঐ চোরটাই নিয়েছে।

কিন্তু দুপুরবেলা পান খেতে গিয়ে ভাঁড়ুর ছোটকাকীমা যেই না একটু খাটের তলায় ঢুকেছে, অমনি দেখে ··

কে একটা শুয়ে আছে ঘাপটি মেরে !

কে রে ?

কোন সাড়া নেই।

একটু উঁকি দিতেই একটা কান চোখে পড়ল। ধবধবে সাদা।

তবে কি ভাঁড়ুর সেই তুলোর খরগোসটা নাকি ?

না। না। তা ত নয়।

ঐ ত ল্যাজ নড়ছে !

ল্যাজ ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ল্যাজ।

ভাঁড়ুর কাকীমা ঘাবড়ে গিয়ে চেল্লে উঠল ! আর মোতির মা বাসন মাজতে মাজতেই ছুটে এল খুন্তি হাতে। কিন্তু যে পালাবার জন্যে রেডি সে তখন পালাচ্ছে পাঁচিল দিয়ে। মোতির মা অমনি চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। বললে, ওমা ! ঐত সেই ও বাড়ির মিঠিনদের বেড়ালটা ! ঐত. পালাচ্ছে—

কিন্তু ওর যেন কি একটা নাম আছে আবার !

নাম ?

হ্যাঁ, নাম আছে বৈকি বেড়ালটার।

আহারে ! সেইটাই ত আর কারো মনে পড়ল না তখন।

জানা গেল একবারে বিকেলবেলা। যখন ইসকুল থেকে ফিরে ভাঁড়ুই শুধু বললে, এমা ! জান না,—ওরই নাম ত সেই ভুতনি !
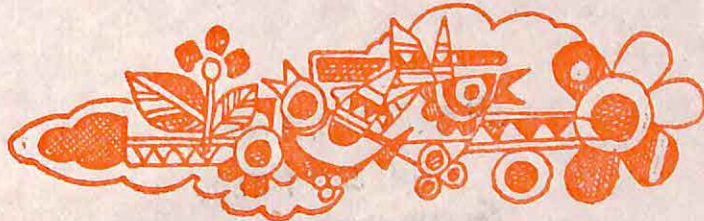
এমনি আরো বই রয়েছে
তলায় তলায় হাসি,
একটা হল 'বাঘের বন্ধু'
একটা 'পাতার বাঁশি'।
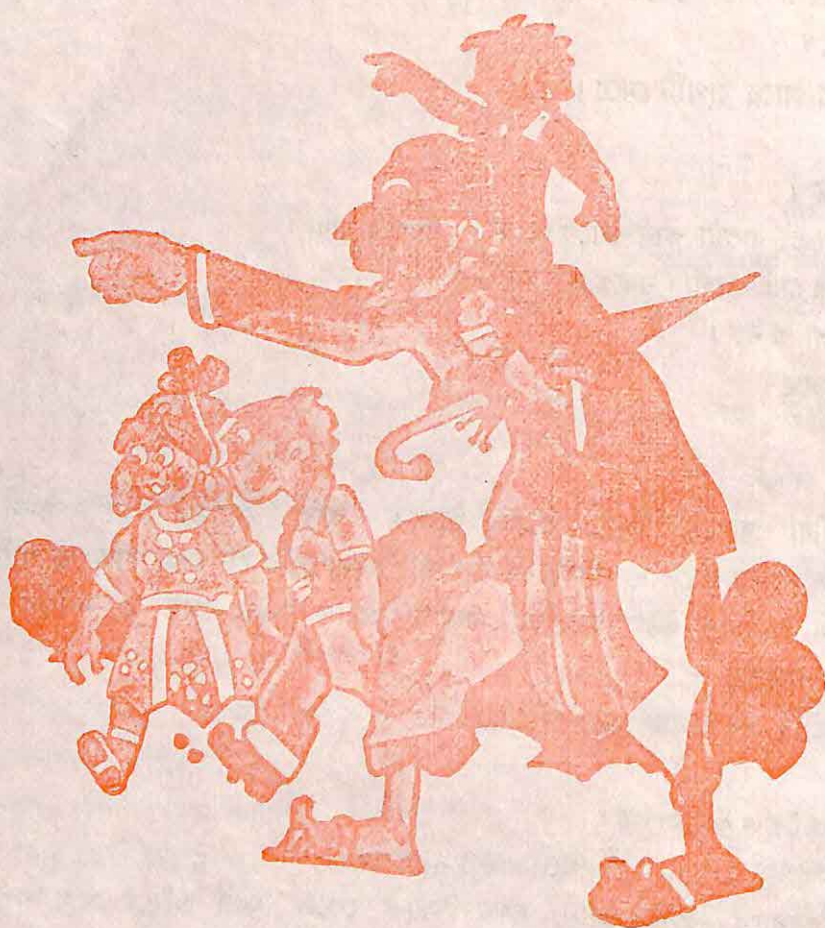
এই বইটা লাগল কেমন
মুন্না এবং মিঠির,
লিখলে জেনো, ছড়ায় লেখক
জবাব দেবেন চিঠির।

আমাদের জনপ্রিয় শি
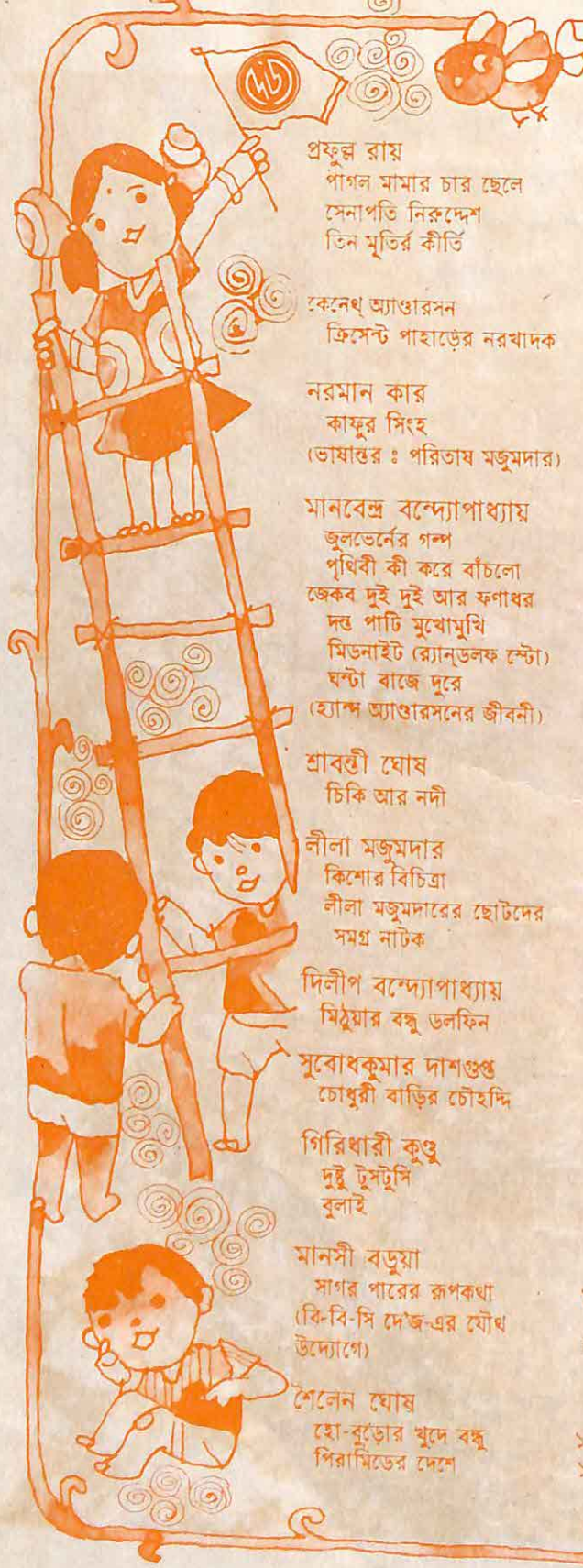
প্রফুল্ল রায়
- পাগল মামার চার ছেলে — ১২ ০০
- সেনাপতি নিরুদ্দেশ — ১০ ০০
- তিন মূর্তির কীর্তি — ১২ ০০

কেনেথ্ অ্যাণ্ডারসন
- ক্রিসেন্ট পাহাড়ের নরখাদক — ১৫ ০০

নরমান কার
- কাফুর সিংহ — ১০ ০০
(ভাষান্তর : পরিতোষ মজুমদার)

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- জুলভের্নের গল্প — ১০ ০০
- পৃথিবী কী করে বাঁচলো — ১০ ০০
- জেকব দুই দুই আর ফণাধর দন্ত পাটি মুখোমুখি — ৬ ০০
- মিডনাইট (র‍্যান্‌ডলফ স্টো) — ১০ ০০
- ঘন্টা বাজে দূরে — ২০ ০০
(হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের জীবনী)

শ্রাবন্তী ঘোষ
- চিকি আর নদী — ৬ ০০

লীলা মজুমদার
- কিশোর বিচিত্রা — ২০ ০০
- লীলা মজুমদারের ছোটদের সমগ্র নাটক — ২০ ০০

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন — ৬ ০০

সুবোধকুমার দাশগুপ্ত
- চৌধুরী বাড়ির চৌহদ্দি — ১২ ০০

গিরিধারী কুণ্ডু
- দুষ্টু টুসটুসি — ৮ ০০
- বুলাই — ৬ ০০

মানসী বড়ুয়া
- সাগর পারের রূপকথা — ১২ ০০
(বি-বি-সি দে'জ-এর যৌথ উদ্যোগে)

শৈলেন ঘোষ
- হো-বুড়োর খুদে বন্ধু — ১০ ০০
- পিরামিডের দেশে — ১০ ০০

রনাল্ড সেগাল
- টোকোলোশ — ১০ ০০
অনুঃ সুবীর রায়চৌধুরী

আনন্দ বাগচী
- ভূতরহস্য — ১০ ০০

কিন্নর রায়
- আলেকজাণ্ডারের বর্শা — ৮ ০০

শুদ্ধসত্ত্ব বসু
- কর্পূরের মতো — ৮ ০০

পরিচয় গুপ্ত
- দৈত্য যখন ভয়ঙ্কর — ৩০ ০০
- ভৌতিক শিকার কাহিনী — ৭ ০০
- আষাঢ়ে ভূতের গল্প — ১৫ ০০
- ভূত যখন পুত — ৫ ০০
- মানুষ যখন ভয়ঙ্কর — ৭ ০০
- মরণের মুখোমুখি — ৭ ০০
- ছায়ামূর্তি — ৬ ০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
- ছড়ায় মোড়া কলকাতা — ১০ ০০
- কলকাতার প্রথম — ১২ ০০
- ওদের চোখে মোদের ভারত — ১২ ০০
- হাসতে হাসতে খুন — ১২ ০০

শৈবাল চক্রবর্তী
- পথিক রাজপুত্র — ১০ ০০

কার্তিক ঘোষ
- পাতার বাঁশি — ৫ ০০

ডাঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সম্পাদিত
- বনফুল কিশোর সমগ্র (১ম) — ৩২ ০০
- (২য়) — ৩০ ০০

সুবীর রায়চৌধুরী
- মেলা থেকে ঝামেলা — ৭ ০০
- গোলন্দাজ থেকে গোয়েন্দা — ৭ ০০

দে'জ পাবলি

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

অর্ধেন্দু দত্ত
শিকারের গপ্পো ১০ ০০

শংকর
এক ব্যাগ শংকর ১২ ০০
চিরকালের উপকথা ১২ ০০

নারায়ণ সান্যাল
ডিজনেল্যাণ্ড ২৫ ০০
না-মানুষের পাঁচালী ১২ ০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
হাতি ধরিয়ে নায়ার ১০ ০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র
হ্যানস্ অ্যাণ্ডার সনের গল্প ১৫ ০০
কিশোর সম্ভার ৩০ ০০
গড়জঙ্গলের কাহিনী ১৫ ০০
ছোটদের বেতালের গল্প ১২ ০০
পাতাল পুরীর কাহিনী ১২ ০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
জঙ্গলের চাবি ২০ ০০
আকাশ দস্যু ১৫ ০০
বরণীয় মানুষ ঃ
স্মরণীয় বিচার ১৫ ০০

অনিলকুমার চক্রবর্তী
ছোটদের রাজমালা ১২ ০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
পিন্টিদার পঞ্চবান ১৮ ০০
লিডার বটে পিনডিদা ১২ ০০
পিনডিদার গপ্পো ১০ ০০
সিকেপিকেটিকে ১৫ ০০
ফয়সালা ১২ ০০

ইন্দিরা দেবী
বুনুর অসুখ ৮ ০০
গল্প বলছি ইন্দিরাদি ১০ ০০

ফণিভূষণ আচার্য
সোনার সুটকেস ৬ ০০

ধর্মদাস মিত্র
মাষ্টারমশাই ৬ ০০

সৈয়দ মুজতবা সিরাজ
রহস্য রোমাঞ্চ ১২ ০০
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস ৩২ ০০
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর ১৪ ০০
হাট্রিম রহস্য ১২ ০০
কালোমানুষ নীল চোখ ১৬ ০০
কালো বাকসের রহস্য ১০ ০০
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ ৮ ০০
বনের আসর ১০ ০০
ভয়-ভূতুরে ৬ ০০
নিঝুম রাতের আতঙ্ক ৭ ০০
টেরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর ৭ ০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
দুনিয়ার ঘনাদা ১৫ ০০
পিঁপড়ে পুরান ১০ ০০
পাতালে পাঁচবছর ১৫ ০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে ৮ ০০
কথার কথা ১০ ০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়
রাশি রাশি হাসি ১৫ ০০
ভূত অদ্ভুত ৮ ০০
বাজপাখির চোখ ১২ ০০

শঙ্খ ঘোষের ছড়া
গনেশ পাইনের ছবি
সব কিছুতেই খেলনা হয় ১০ ০০

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়
হলুদ আতঙ্ক ৮ ০০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডোরাকাটার খোঁজে ১৪ ০০
সুন্দর বনের আতঙ্ক ১৫ ০০
বাক্‌লার জঙ্গলে ১০ ০০
শিকারের বিচিত্র কাহিনী ২০ ০০
বাঘ বাঘিনী ১৫ ০০

সুনির্মল বসু
জীবন্ত কঙ্কাল ১৫ ০০
ছোটদের বিদ্যাসাগর ৭ ০০

কলিকাতা ৭০০০৭৩